দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 12 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্পে এনজিও বাছাইয়ে ব্যাপক দুর্নীতি॥ কাজ দেয়া হয়েছে ঘুষ নিয়ে

সাহিদুল ইসলাম চৌধুরী ॥ নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্পের 'মানব উন্নয়নে সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য এনজিও বাছাইয়ে ব্যাপক দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে সরকারের এক উপদেষ্টার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা। বাছাইকৃত এনজিওগুলোর মধ্যে প্রায় সবই কাজ নিয়েছে ঘুষ ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে। চক্রটি এসব এনজিওর কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছে প্রায় ছয় কোটি টাকা। রাজনৈতিক বিবেচনাও কিছুটা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল বাছাই প্রক্রিয়ায়। নিজস্ব যোগ্যতায় কাজ পেয়েছে, এমন এনজিওর সংখ্যা গুটিকয়েক। নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্পে লাগামহীন এই দুর্নীতি ও অনিয়ম বিশ্বব্যাংকসহ দাতা সংস্থাগুলোকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

(৭- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

(প্রথম পাতার পর)

এনজিও বাছাইয়ের এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে গত এপ্রিল নাগাদ। বিশ্বব্যাংক ও এনজিও সেক্টরের বিভিন্ন ব্যক্তিরা সম্প্রতি বাছাই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বাছাই প্রক্রিয়ায় দাতা সংস্থা ও এনজিও প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তা জবাবে বলেছেন, এতে বাছাই প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হবে।

চক্রের সদস্য কারা?

সূত্রগুলো জানিয়েছে, এবার ঘুষের হাতবদল হয়েছে ঐ উপদেষ্টার ছেলে, বিগত সংসদ নির্বাচনে রাজবাড়ী সদর আসনে বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত ও উপদেষ্টার ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি, উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের এক উপপরিচালক ও বৃহত্তর ঢাকার এক জেলা সমন্বয়কারী, রাজবাড়ী ছাত্রদলের এক সাবেক সভাপতি এবং রাজবাড়ীর মানুষের কাছে 'আলম চাচা' হিসাবে পরিচিত এক ব্যক্তির মাধ্যমে। এর মধ্যে অন্তত দু'জন ঐ উপদেষ্টার সরকারী বাসভবনে বসবাস করেন।

ঘুষের টাকা ফেরত চেয়ে মামলা

সূত্রগুলো বলেছে, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্পে এই চক্রটির দুর্নীতি, অনিয়ম ও ঘুষ আদায়ের ঘটনা এবারই প্রথম নয়, ২০০২ সালেও একই প্রকল্পের কাজ বরাদ্দের সময় মোটা অঙ্কের ঘুষ লেনদেন হয়েছে। এ ধরনের লেনদেনের অন্তত একটি ঘটনায় ঐ উপদেষ্টার ঘনিষ্ঠ পাঁচ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঢাকার সিএমএম আদালতে চলতি বছর একটি মামলা দায়ের করেছেন ঘুষ প্রদানকারী এক ব্যক্তি। মামলা নম্বর ৮১১/২০০৩। মামলার বিবাদীদের সবার স্থায়ী ঠিকানা রাজবাড়ী। মামলার আর্জিতে বলা হয়েছে, মামলার এক নম্বর আসামী প্রস্তাব করে যে, 'সরকারের নিকট হতে গণশিক্ষা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের ৬ কোটি টাকার কাজ এনে দেবে। এজন্য সে (এক নম্বর বিবাদী) কমিশন বাবদ ২০ শতাংশ (১ কোটি ২০ লাখ টাকা) নেবে। কাজের তদ্বির করার জন্য ৭ লাখ টাকা তাৎক্ষণিকভাবে এবং মন্ত্রণালয় প্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে ৪৩ লাখ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকা পর্যায়ক্রমে বাদী বিবাদীকে পরিশোধ করবে'। সেই মোতাবেক বাদী এক নম্বর বিবাদীকে নগদায়নযোগ্য ৭ লাখ টাকার একটি চেক (নম্বর ৬৮৮৪২১২, তারিখ ০৩-০৭-২০০২, জনতা ব্যাংক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা) এবং ৪৩ লাখ টাকার একটি অগ্রিম চেক (নম্বর ১১৫৩১২৮, তারিখ ৩০-০৭-২০০২, জনতা ব্যাংক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা) প্রদান করে।

জনকণ্ঠের অনুসন্ধানে জানা গেছে, চক্রটি ৭ লাখ টাকা তুলে নিয়েছে। কাজ না দেয়ায় ৪৩ লাখ টাকার চেকটি নগদায়ন করা যায়নি। এছাড়া ২০০২ সালে অনেক এনজিওর কাছ থেকে ঘুষের টাকা নিয়েও কাজ দেয়া হয়নি। কোন কোন এনজিওর কাছ থেকে কয়েকটি ইউনিটের জন্য টাকা নিয়ে মাত্র ১ ইউনিটের কাজ দেয়া হয়েছে।

একটি সূত্র জানিয়েছে, উপদেষ্টার ঘনিষ্ঠ ঐ ব্যক্তিকে (মামলার এক বিবাদী, যে রাজবাড়ী ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি) সদ্যসমাপ্ত অপারেশন ক্লিনহার্টের সময় সেনাবাহিনী আটক করে ঢাকার কোতোয়ালি থানায় সোপর্দ করেছিল। পরে ঐ উপদেষ্টার টেলিফোনের নির্দেশে থানা থেকে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়।

ইউনিটপ্রতি দু' লাখ

সূত্রগুলো জানিয়েছে, চলতি ২০০৩ সালে প্রায় সব এনজিওকে ইউনিটপ্রতি দুই লাখ টাকা দিতে হয়েছে। উল্লেখ্য, নিরক্ষরতা দূরীকরণের এই কর্মসূচিতে একেকটি উপজেলায় দু'টি করে ইউনিট থাকে। প্রতিটি ইউনিটের জন্য বরাদ্দ রয়েছে প্রায় সাড়ে ২২ লাখ টাকা। কোন এনজিও ক'টি ইউনিটের কাজ পাবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাও নির্ধারিত হয়েছে ঘুষ দেয়া না দেয়ার ওপর।

সূত্র জানায়, ঐ চক্রটির সন্ধান ২০০২ সালে অনেকেই জানত না। চক্রটিও অনেক এনজিওর যোগসূত্র চিনত না। ফলে ঘুষ আদায়ও হয়েছিল কম। উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা দফতরের কর্মসূচীতে কাজ করে এমন প্রতিটি এনজিওর কাছে এই চক্রটি এখন সুপরিচিত। ফলে এবার প্রতিযোগীর সংখ্যা বেশি। ঘুষও হাতবদল হয়েছে বেশি।

এনজিও বাছাইয়ের নির্ধারিত যোগ্যতা কি ছিল?

উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান জনকণ্ঠকে বলেছেন, এনজিও বাছাইয়ের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে চারটি পর্যায়ে। প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন করেছে অধিদফতরের এক উপপরিচালকের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি। এ পর্যায়ে এনজিওগুলোর বৈধ রেজিস্ট্রেশন থাকা, নারী ও শিশু বিষয়ক কর্মসূচীতে ন্যূনতম তিন বছর এবং উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীতে ন্যূনতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকা, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলাগুলোয় মৌলিক সাক্ষরতা কর্মসূচী পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকা, উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি কর্মকর্তা থাকা এবং এনজিওর অফিস, গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা কমিটি থাকার বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে। এনজিওর মূল বাছাইয়ের কাজটি হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে, অধিদফতরের পরিচালকের (বাস্তবায়ন) নেতৃত্বাধীন একটি কমিটির মাধ্যমে। প্রাথমিক বাছাইয়ে টিকে যাওয়া এনজিওগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের বিবেচনায় এসেছে। এ পর্যায়ে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের আওতায় ইতোপূর্বে কর্মসূচী পরিচালনার অভিজ্ঞতা, পূর্বতন কর্মসূচী বাস্তবায়নের নৈপুণ্য বা মান বা সাফল্য, এনজিওর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য (অডিট রিপোর্ট, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা, তাঁদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি), প্রকল্প এলাকায় এনজিওটির গ্রহণযোগ্যতা, সরকারী-বেসরকারী অন্য এনজিওর সঙ্গে কাজ করার পূর্ব-অভিজ্ঞতাসহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এনজিওগুলোর মধ্যে নম্বর বণ্টন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় মোট ৫০ নম্বরের মধ্যে সর্বনিম্ন ২৫ নম্বর পেয়েছে, এমন ৩২৩টি এনজিওকে নির্বাচন করা হয়েছে। উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত তৃতীয় কমিটি ঐ তালিকাটি খতিয়ে দেখেছে। এনজিওগুলোর মধ্যে কর্মএলাকা বণ্টন করবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত চতুর্থ কমিটি।

আসলে যা ঘটেছে

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলেছে, এনজিওর অস্তিত্ব বাস্তবে আছে কি নেই, তারা আসলে কর্মসূচী বাস্তবায়নে সক্ষম না অক্ষম, বাছাইয়ে এসব তেমন বিবেচনা করা হয়নি। ক্যাম্পে, সিডিএসহ সুখ্যাত কোন এনজিও ডাটা-ব্যাংকের কাছ থেকেও কোন তথ্য যাচাই করা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে কেবল 'ঝকঝকে ছাপার কাগজে রিপোর্ট' বিবেচনা করা হয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘুষ বিনিময়ই নির্ধারণ করে দিয়েছে এনজিওগুলোর ভাগ্য।

এনজিওগুলোর মধ্যে ৫০ নম্বর বণ্টনের বিষয়টি এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে নম্বরের সামান্য হেরফের (দশমিক ১ থেকে দশমিক ৯ পর্যন্ত) করেও তালিকায় বড়রকম রদবদল ঘটানো যায়। এই প্রক্রিয়ায় বিবেচ্য ১৬টি ক্ষেত্রের কয়েকটিতে কোন এনজিওকে গড়ে ন্যূনতম দশমিক ১ করে দিলেও এনজিওটি অন্য শত শত এনজিওকে পিছনে ফেলে দিতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোন নম্বর না পেয়েও নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে বেশি নম্বর পেয়ে তালিকায় ওপরের দিকে স্থান করে নিয়েছে, এমন এনজিও'র সংখ্যা বিপুল।

৩২৩ এনজিওর তালিকাটি বিশ্লেষণ করে এনজিও খাতের অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, পূর্বতন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আদৌ কোন সাফল্য না থাকায় ৫-এর মধ্যে 'শূন্য' পেয়ে অথবা নামমাত্র বাস্তবায়নের জন্য সামান্য নম্বর পেয়েও বাছাই তালিকায় ঠাঁই করে নিয়েছে শতাধিক এনজিও। প্রকল্প এলাকায় গ্রহণযোগ্যতা শূন্যের কোঠায় বা তার কাছাকাছি এমন ১৮৬টি এনজিও নির্বাচিত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যের বিবেচনায় গুটিকয়েক কর্মকর্তা ও নামমাত্র কাঠামোসম্পন্ন এনজিওকে দেয়া হয়েছে শত শত দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ দেশব্যাপী সক্রিয় নেটওয়ার্ক রয়েছে এমন এনজিওর সমান বা প্রায় সমান নম্বর।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

'মানব উন্নয়নে সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য এনজিও বাছাইয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুষ বিনিময় প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান জনকণ্ঠকে বলেন, এই বিষয়গুলো তাঁর জানা নেই। কেউ তাঁকে জানায়নি, কোন অভিযোগও আসেনি। অবশ্য তিনি বলেন, বাছাইকৃত এনজিওগুলোর মধ্যে অনেকগুলোরই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'শূন্য' পাওয়ার বিষয়টি তাঁর নজরে